Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 484 – 495
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

পাতালপুরীর ভাষা : এক স্বল্প-আলোকিত অধ্যায়

ড. সোমনাথ চক্রবর্তী
Email ID : somnathc573@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
Disguise Language, different meaning, Criminals using their language, Patal Purir Bhasa.

Abstract
Today no country is crime free. Criminals are committing crimes everywhere. They connect with each other in their own language. We called this language Criminal World's Language. This language is a social dialect and also local dialect. Professional criminals are use this language in their own manner. They use code to communicate with each other. Antisocial also called this language in their own periphery. In different country this language is known in different name. such as in Japan it is called 'INGO'. In Bengali it is also known by Disguise Language. Criminals are using slang language in their own world. About this world's language common people are unaware. They can not realise the meaning of this kind of language. Criminals are always trying to keep the meaning of the language in their own world. Every word have different meaning. Each word also reflect different meaning. In this world if one word is use by different kind of criminal it should reflect different meaning. Pick pocketer, kidnappers, smugglers, gambler are use their own language to aware their partner about the situation, kind of work, place, police, target etc. it is also done in different manner. Criminal world language reflect the mentality of a criminal and their behaviour. Beside this it also reflect culture and manner of a criminal and its periphery. To know this world we should about this language.

Discussion
সমাজ প্রতিবিম্বিত হয় সাহিত্যের পাতায়, একথা সর্বজন বিদিত। রচয়িতা সমাজেরই প্রতিনিধি। তাঁর রচনাকর্ম কখনই সমাজ বিবিক্ত হতে পারে না। খুব সংগত কারণেই সাহিত্যের পাতায় সমাজের উদ্ভাস। চরিত্র বা ঘটনায় সমাজ বাস্তবতার ছাপ অনেকাংশেই প্রকট হয়। এখানে মানুষ তার ক্রিয়াকর্মই কল্পনার জারকরসে জারিত হয়ে পাঠকের আস্বাদনের জন্য পরিবেশিত হয়। মানুষের সুকোমল বৃত্তি, মানবিক গুণাবলি, মানবতাবোধ প্রভৃতির মতো শুভ চেতনার পাশাপাশি অনায়াসেই জায়গা করে নেয় মানব মনের তমসাঘন দিকগুলির কথা। সেখানে চুরি, ধর্ষণ, খুন, লুটপাট, প্রবঞ্চনা

প্রভৃতির মতো মানবিকতার পরিপন্থি দিকগুলি ধরা পড়ে, যাদের এককথায় বলা যায় অপরাধ বা অপরাধ প্রবণতা। মানবতার পক্ষে এই অকল্যাণকর দিকগুলিকে কখনই সমাজ-রাষ্ট্র স্বীকৃতি দেয় না। আবার তাকে অস্বীকার করতেও পারে না। কেননা, আলোর বিপরীত যেমন অন্ধকার ঠিক তেমনি নিরপরাধের অপরাধ। বৈপরীত্যের সহাবনস্থানেই সমাজ চর্যার অনুশীলন।

'রাধ্' ধাতুর সঙ্গে 'অপ' উপসর্গ, 'ঘঞ্' প্রত্যয় ও বিভক্তি যোগে বিশেষ্যপদ 'অপরাধ' শরীরি রূপ লাভ করেছে। শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল স্বকর্তব্যের অকরণ জন্য দোষ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম জন্য দোষ;[১] দণ্ডনীয়কার্য, পাপ, নিয়মলঙ্ঘন, আইনের বিরুদ্ধাচারণ, ত্রুটি;[২] দোষ, ত্রুটি, পাপ, দুষ্কর্ম, বেআইনি কাজ[৩] অপকম্ম জন্য দোষ, ত্রুটি, পাপ, আইনবিরুদ্ধ কর্মজনিত রাজদ্বারে দণ্ডার্হ;[৪] গর্হিতকাজ, দোষ, ত্রুটি, পাপ, অধর্ম।[৫]

বর্তমান বিশ্বের এক অন্যতম মারাত্মক ব্যাধি হল অপরাধ। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই ব্যাধি মানুষের সমাজকে সংক্রমিত করেছে বা করে চলেছে। ব্যষ্টি বা গোষ্ঠীর অপরাধমূলক আচরণ প্রতিটি জাতির কাছে অভিশাপ। ব্যক্তির অপরাধমূলক আচরণ সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে বাধা। এর উপস্থিতি সমাজের সংহতিকে নষ্ট করে। ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশ ব্যাহত হয়। পরিণামে সামাজিক প্রগতি হয় দিশেহারা।

এখন প্রশ্ন হল অপরাধ কী? অপরাধ হল একটি অবাঞ্ছিত আচরণ। মানুষের যেসব কাজ সমাজের চোখে অগ্রহণযোগ্য এবং আইনের দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য। প্রতিটি সমাজব্যবস্থার মধ্যেই দুষ্কৃতিমূলক আচরণের বীজ নিহিত থাকে। এটি সমাজ কাঠামোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভারতীয় সমাজের প্রেক্ষিতে যেটি দুষ্কৃতিমূলক আচরণ অন্য দেশে তা নাও হতে পারে অর্থাৎ দুষ্কৃতিমূলক আচরণ বলতে এমনই এক ধরনের আচরণকে নির্দেশ করা হয় যা স্বাভাবিক ও কাঙ্ক্ষিত আচরণের পরিপন্থী। প্রচলিত আইন-কানুন, মূল্যবোধ এবং রীতি-নীতির পরিপন্থী এই আচরণগুলি সমাজ সংহতির পরিপন্থী। আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে আইন বিরোধী কাজকেই অপরাধ বলে থাকি অর্থাৎ অপরাধ হল সেই সমস্ত কাজ যা আইন ভঙ্গ করে। যেসব সমাজ বিরোধী কাজ মানুষের আবেগ অনুভূতিকে আহত করে সমাজে দুর্নীতির জন্ম দেয়, সমাজ তথা রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতি করে সেই সব মানবিকতার পরিপন্থী কাজগুলোকে আমরা অপরাধ বলে বিবেচনা করি। সেখানে চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, খুন, জখম, ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি, অশ্লীল ইঙ্গিত, মিথ্যাকথন, মদচোলাই, পকেটমারি, রাহাজানি, চোরাই মাল কেনাবেচা প্রকৃতি যে কোনো কাজ অপরাধের সঙ্গে যুক্ত। ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় উপর্যুক্ত কাজগুলিকে অপরাধ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন- ৩০২ নং ধারা খুন, ৩০৭নং ধারা খুনের চেষ্টা, ৩২৬নং ধারা অ্যাসিড হামলা, ৩৬১ নং ধারা অপহরণ, ৩৭৫নং ধারা ধর্ষণ, ৩৭৯ নং ধারা চুরি, ৩৯০ ও ৩৯১ নং ডাকাতি, ৩৯৪নং ধারা ছিনতাইয়ের চেষ্টা জখম, ৩৯৭ নং ধারা ডাকাতির চেষ্টায় খুন, ৪১৫ নং প্রতারণা প্রভৃতি।

মানব সভ্যতার সৃষ্টিলগ্নে অপরাধের জন্ম ছিল না বললেই হয়। আদিম মানুষ জীবন সংগ্রামের পথ বেয়ে আবিষ্কার করেছিল পশুপালন চাষবাস প্রভৃতির মতো স্বনির্ভরতার দিকগুলি। তবে সেখানে ব্যক্তি নয় গোষ্ঠীচেতনাই মুখ্য স্থান লাভ করেছিল। দলগত অবস্থানে সমর্থ মানুষ নির্বাচিত হল গোষ্ঠীপতি রূপে। আর এই গোষ্ঠীপতিরাই হলো প্রথমদিককার অপরাধী। কেননা, মানুষের শ্রম, গোষ্ঠীর সম্পত্তি তারা দখল করেছে। পুরুষের কর্ম ও মর্মসঙ্গী নারী হারিয়েছে তার স্বাধীনতা। তাদের সত্তাকে অস্বীকার করার এক নির্লজ্জ প্রয়াস প্রকট হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, তারা পরিণত হয়েছে পুরুষের ভোগের সামগ্রী হিসাবে। পুরুষশাসিতসমাজ ব্যবস্থায় ক্রমে ক্রমে এসেছে দাসপ্রথা, গণিকাবৃত্তি, যুদ্ধ, অপহরণ প্রভৃতির মতো অমানবিক আচরণগুলি। কালের ধারায় সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন এসেছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উত্তরণ ঘটেছে ধনতন্ত্রে। সমাজ ভাগ হয়েছে শোষক আর শোষিতের শ্রেণিতে। এই বিভাজন বা বিবর্তনে রয়েছে দীর্ঘ সময় আর এক ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার সূত্র।

একথা অস্বীকার করা যায় না সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অপরাধপ্রবণতা প্রথম সুচারু রূপ পেয়েছে। তবে তার প্রকট রূপ ছিল না। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় এই অপরাধপ্রবণতা ভিন্নরূপে মানুষের মজ্জায় অবস্থান করেছে অর্থাৎ সমাজ বিবর্তনের কালে অপরাধপ্রবণতার চোরাস্রোত বয়েছে নিজ খাতে। জন্ম নিয়েছে অপকৃতি বা অপকৃষ্টি(Anti

culture)। বিকৃত যৌন আচরণ, হিংসাত্মক কার্যকলাপকেই সাধারণভাবে অপকৃতি বা অপকৃষ্টি নামে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

এক মারাত্মক ব্যাধি। বটবৃক্ষের শেকড়ের মতো এই সামাজিক ব্যাধি বহুবছর ধরে আমাদের সমাজকে আঁকড়ে রেখেছে। প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলে রাখা দরকার- যে সংস্কৃতি সমাজ ও তার মানুষের প্রগতির প্রতিকূল তাই হল অপকৃষ্টি অর্থাৎ মানুষ ও তার সমাজের প্রতিকূল ক্রিয়া-কর্মই হলো অপরাধ। আর সেই জগতে যাদের বিচরণ তারা আইনের চোখে অপরাধী। এই জগতের আচার-আচরণ, রীতিনীতি সম্পূর্ণই ভিন্ন হয়।

মৌন মানুষ যেদিন থেকে মুখর হয়েছে সেদিন তার মুখে জন্ম নিয়েছে ভাষা। আর সেই ভাষা কালের হাওয়ায় বারবার তার দিক পরিবর্তন করেছে প্রয়োজনের নিরিখে। একই শব্দের ব্যবহারে গড়ে উঠেছে অর্থ পার্থক্য। আর সেটার পিছনে আছে ভাষা ব্যবহারকারীর সামাজিক অবস্থান। আসলে ভাষা হল মানুষের মন ও তার সভ্যতার মানচিত্র। সেই ভাষা রূপ তার ব্যবহারকারীর মানসিক গঠন, শিক্ষা, রুচি ও পরিবেশ সম্পর্কে জানান দেয়।

একই ভাষায় সাধু, কথ্য, উপভাষা, বিভাষা প্রভৃতি রূপ দেখা যায়। ব্যক্তি মানুষ তার মাতৃভাষায় ভিন্ন ভিন্ন রূপের সঙ্গে পরিচিত হয়। সমাজ জীবনে যেমন মানুষের নানা সত্ত্বা থাকে তেমনি ভাষারও। সভ্য পরিবেশে সে যে রূপ ধরে অপরাধজগতে তার রূপ যায় সম্পূর্ণ পাল্টে। সমাজের সমস্ত শ্রেণির মানুষ যেমন সমাজেরই অঙ্গ তেমনি অপরাধজতের ভাষাও। অপরাধজগত পাতালপুরীর জগত। এদের ভাষা মান্য সাহিত্যে স্থান পায় না। যদিও কালের ধারায় অনেক শব্দই সাহিত্যের পাতায় বা লোক মুখে স্থান করে নিয়েছে।

সমাজ জীবনে বিভিন্ন শ্রেণির ও জীবিকার মানুষের যেমন একটি নির্দিষ্ট ভাষা আছে অপরাধীদেরও। অপরাধীদের ভাষাকে আমরা Social Dialect বা সামাজিক ভাষা হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। এতে আঞ্চলিকতার ছাপ স্পষ্ট। কেননা, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে অপরাধীরা একত্রিত হয়। তাদের কথায় লোকাল ডায়ালেক্ট(Local Dialect)-এর ছাপ। কলকাতা অঞ্চলের অপরাধীরা যেমন কলকাতা- ককনি জাতীয় ভাষায় কথা বলে তেমনি দক্ষিণপ্রান্ত বা উত্তরবঙ্গের অপরাধীদের ভাষা ভিন্ন হয়।

এছাড়াও বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে অপরাধীরা পশ্চিমবঙ্গে আসে। তাই বাংলার অপরাধজগতের ভাষায় বাংলা, হিন্দি, ভোজপুরি, মগহী, উর্দু প্রভৃতি মিলিয়ে এক মিশ্রভাষার জন্ম হয়। এ ভাষা তাদের বড়ো প্রিয় ভাষা।

অপরাধজগতের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তার ভাষারও বিস্তার ঘটে চলে। বাংলায় অপরাধজগতের ভাষার বিস্তার দ্বিধারায়-
১. পেশাদারি অপরাধজগতের ভাষা, ও
২. বয়ে যাওয়া যুবক, উঠতি গুণ্ডা ও মস্তানদের ভাষা বা সমাজবিরোধীদের ভাষা।
পেশাদার অপরাধীরা তাদের ভাষার মধ্যে লঘুবুলি, উলটি বা উলটি বাতোলা, প্রতিভাষা, বিপরীত ভাষা বা বিভাষা, ঠার যেটিকে সুকুমার সেন Disguised Language বলেছেন আবার তিনি তাঁর 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে এগুলিকে 'অপার্থ ভাষা' বা 'সংকেত ভাষা' হিসাবে অভিহিত হয়েছে।

সাধারণ ভাবে বিভাষা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিতি লাভ করেছে। জাপানে একে বলা হয় 'Ingo', পশ্চিমবঙ্গের অপরাধীরা একে বলে থাকে উলটি বা উলটি বাতোলা। সাধারণ শব্দ উলটে বা ভেঙে-চুরে এই ধরনের শব্দের বিনির্মাণ হয় বলে এদের উলটি বাতোলা বলা হয়। এদের অর্থ বৈচিত্র্য ও উচ্চারণ বেশ আকর্ষণীয়। প্রসঙ্গত, এই উলটি বাতলার প্রথম উল্লেখ আছে শুক্ল যর্জুবেদ-এ। যদিও এর ব্যবহারে অপরাধের সঙ্গে কোনো যোগসূত্রও ছিল না। সেখানে মূলত অশিষ্ট ভাষাকে শিষ্ট রূপ দেবার জন্য এই পন্থা অবলম্বন। বৈদিক ঋষিরা ধ্বনি বিপর্যয়ের সাহায্য নিতেন –

"যকাহসকৌ শকুন্তিকাহহহলগিতি বঞ্চতি।
আহন্তি গভে পসো, নিগিলগলীতি ধারকা।।"[৬]

২৩ নম্বর আধ্যায়ের ২১ নম্বর শ্লোকে 'গভে' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ভগে শব্দের দ্বারা সেই সময় স্ত্রী যোনি বোঝানো হত। অশ্লীলতা রক্ষায় ভগ শব্দ গভে রূপে উচ্চারিত হত।

বর্তমান কালে অপরাধজগতের বাসিন্দারা বা বখাটে ছেলেরাও আখছার অশ্লীল শব্দের ব্যবহার করে চলেছে। তা অনেক সময় লোকসমক্ষে তার পূর্ণ রূপে বা সেই শব্দটি উলটে পাল্টে তার একটা শিষ্ট রূপ দানের মধ্য দিয়ে।

অপরাধজগতের বাসিন্দারা সততই তাদের জগতের ভাষার গোপনীয়তা রক্ষার চেষ্টা করে। এই উলটি বাতোলা পুলিশ বা সাধারণ মানুষের বধের বাইরে। এমনই কিছু শব্দের উদাহরণ তুলে ধরা হল –

'পকেটমারদের ব্যবহৃত শব্দ'[৭] : ছপপর– বাধা; নিমা– জামার পকেট; সেটে যাওয়া– যে লোক প্রতারিত হবে তার গা ঘেঁসে দাঁড়ানো। চাদর ওড়ানো– বাধা সৃষ্টি করা; আগে দাঁড়ান– যে প্রতারিত হবে তাঁর আগে দাঁড়িয়ে বাধার সৃষ্টি করা।

গব্বাবাজদের ব্যবহৃত ভাষা[৮] : আখড়া– জানালা ভাঙার যন্ত্র; কলম– দরজা, জানালা ভাঙার যন্ত্র; কাটি– জাল চাবি কাঠি; জিগগাঁসা-? আকারের লোহার আঁকশি, এর সাহায্যে পাঁচিল টপকানো হয়।

জুয়াড়িদের ব্যবহৃত ভাষা[৯] : তরকারি– ছয়; হাঁড়ি – ছয়; পাগড়ি– দশ; শিঙাড়া– তিন; বাগবাজার– শূন্য; ছারপোকা- পঞ্চাশ পয়সা; ছাববিসিয়া- তাসের জুয়াড়ি।

জেলখানার কয়েদিদের মধ্যে চালু শব্দ[১০] : চিজ- গাঁজা; দলাইলামা- গাঁজা; দকান- মলদ্বার (অনেক সময় মলদ্বারে লুকিয়ে গাঁজা নিয়ে যাওয়া হয়); জোগারকা চিজ- জেলের মধ্যে গোপনে আমদানি করা সামগ্রী; মাস- জেলখানা; ময়লাখোর- সক্রিয় সমকামী।

অপরাধজগতের ভাষার গ্রহণ-বর্জন, ভাঙাগড়ার পিছনে একাধিক কারণ বর্তমান। কোনো শব্দের অর্থ সর্বজনবোধ্য হয়ে গেলে অপরাধজগতের মানুষেরা তাদের ব্যবহৃত শব্দের অর্থ পরিবর্তন করে নেয়। শব্দ চয়নে তাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ফুটে ওঠে। তারা নিজেদের ব্যবহৃত শব্দের প্রতিশব্দও গড়ে তোলে। এর পিছনে অপরাধীদের সমাজ, পরিবেশ, আচরন, মানসিক বিকাশ ও ভাবধারার উপর নির্ভর করে।

এই জগতের ভাষায় উপমার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তারা মূলত তাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, রাগ-ঘৃণা প্রভৃতির প্রকাশে উপমার ব্যবহার করে থাকে। যেমন[১১] –

আংটি- মেয়েদের কটিদেশ; বোঁটা- কাটা বেলফুল-স্তনবৃন্ত; মনসা- খিটখিটে মেয়ে; আবির- সধরা মেয়ে; আমসি- রোগা মেয়ে; আশোক ফুল- ঋতুবতী মেয়ে; কাঁচকলা- ছোটোমেয়ে; চকলেট- মেদের ঊরু; বিড়াল- সুন্দরী মেয়ে; হনুমানজি- বিকৃতকাম মানুষ; ম্যালেরিয়া- পুলিশ (ম্যালেরিয়ার আক্রমণ থেকে যেমন সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না তেমনি পুলিশের হাত থেকে অপরাধীদেরও); আম- বোমা; খোকা-মদ; ঢল-ঢল-মেয়েদের অন্তর্বাস; ছককা- পানজা- ধীরগতির নারীর নিতম্বের দুলুনি।

সমাজ বিরোধীদের দলের তরুণেরা শিক্ষিত বা অশিক্ষিত দুইই হতে পারে। সেই সব তরুণদের ভাষা আলাদা হয়। তারা তাদের ভাষায় অনেক সময় স্ল্যাং-এর ব্যবহার করে থাকে। কথার মধ্যে স্ল্যাং-এর প্রয়োগ তাদের অত্যন্ত প্রিয়। অপরাধজগতে স্ল্যাং একটি বিশেষ স্থান দখল করেছে। প্রায় প্রত্যেক দেশের অপরাধীদের মধ্যে স্ল্যাং এর ব্যবহার আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় স্ল্যাং ভিন্ন নামে পরিচিত। ইংরেজি ভাষায় অশিষ্ট শব্দ হল স্ল্যাং, ফরাসি ভাষায় একে বলে আরগট, ইতালিদেশে তা গারগো আর ভারতে একে খেউড় বলে। এর সাহায্যে অপরাধীরা অনেক কাজকর্ম চালায়। সাংকেতিক কথোপকথনের জন্য প্রতিনিয়ত নোতুন নোতুন খেউড়-এর সৃষ্টি করে থাকে। সৃষ্ট শব্দগুলির নির্মাণে প্রাচীনত্ব ও আধুনিকতার ছাপ স্পষ্ট। কিছু উদাহরণ এখানে তুলে ধরা হল–[১২]

রুমাল- সিঁদকাঠি; খাউ- চোরাই মালের গ্রহীতা; খাম– দারোগা; সিলচার– গয়না; পিসাকো– কাপড়; চিকান– থালি; জালালি কৈ- আঁধার রাত; (মুজাফরপুর) লেপেই- পুলিস; ডামরি- টাকা; টিন- পকেট; ধুর- মানুষ; বিবিসি- এসো, খানা খাও; ব্রো- যাও; বেব্রো- শীঘ্র যাও। (ইরানি দল)

গোপন শব্দের সঙ্গে সঙ্গে 'লঘু বুলি'র ব্যবহার করে থাকে। যেমন[১৩] – খচা- বিরক্ত; লককা- বাবুছেলে; অককা- মৃত্যু; মদনা- বোকা; এ্যাওলা স্যাওলা- এলোমেলো।

বয়ে যাওয়া তরুণ সম্প্রদায় বা ছাত্র বুলির সঙ্গে অপরাধজগতের ভাষার অনেক পার্থক্য; যদিও তা বর্তমানে অনেকাংশে লোপ পাচ্ছে। কিছু উদাহরণের সাহায্য আমরা বিষয়টি অনুধাবনের চেষ্টা করব[১৪] –

শব্দ	**অপরাধী**	**ছাত্র**
১. কমলি	ধর্ষণ	মেয়ে
২. পাগলি	জেলের বিপদ ঘণ্টা	চটুল মেয়ে
৩. ভেড়ুয়া	বেশ্যার প্রিয়জন	গ্রাম্যলোক
৪. আওয়াজ	ছুরি	বিরক্ত করা
৫. ভিততর	জেলখানা	বেদম মার

একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অপরাধীদের দ্বারা ব্যবহৃত হলেও তার অর্থ সব সময় একই থাকে না।[১৫]

সওদা – পকেটমারদের কাছে নোটের তাড়া; তোলনকারীদের কাছে মাল বা বাক্স; বারাঙ্গনাদের কাছে খদ্দের।

কানি – চোরের কাছে জামাকাপড়; মস্তানদের কাছে বিয়ে।

মাস – চোরের কাছে মাল; মস্তানদের কাছে সমাজ; পতিতাদের কাছে ঋতুকাল।

ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক শব্দের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অপরাধীরা নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করে থাকে[১৬]- বেহুলা-কনে; ভোগিরথ জনোনি-সমকামী স্ত্রীলোক; ভোলস-গাঁজা; বাবোন বিভিসোন-পুলিশ।

অপরাধজগতের অনেক ভাষাই যেগুলি একসময় স্ল্যাং বলে বিবেচিত হত তা আজ ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া বা প্রিন্টিং মিডিয়ার দৌলতে সর্বজন বোধ্য ও গ্রাহ্য হচ্ছে[১৭] -

কেপমারি- চুরির এক বিশেষ পদ্ধতি। দক্ষিণ ভারত থেকে আসা একদল অপরাধী এর প্রথম প্রচলন করে। তাদের চুরির পদ্ধতিও ছিল নিত্যনোতুন। প্রতারিতকে তারা বিভিন্নভাবে বিভ্রান্ত করে কাজ হাসিল করত।

খালিকুটি – সন্ধ্যার পর পতিতাদের ব্যবহার ঘর। সে ঘরগুলি দিনের বেলায় খালি পড়ে থাকে।

গাদা – বন্ধুক।

মএদানি – কলকাতার ময়দানে রাতের নোংরামি।

অপরাধজগতের ব্যবহৃত শব্দের একই রূপ ভিন্নভিন্ন সময়ে ভিন্নভিন্ন অর্থ ফুটিয়ে তোলে। কেননা, সময়ের ধারা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজেরও পরিবর্তন ঘটে তেমনি বদল আসে শব্দের অর্থের। বারবার ব্যবহারে একই শব্দ তাঁর অর্থের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে নোতুন অর্থের সন্ধান করে চলে –

মেয়ে[১৮] শব্দটি বিভিন্ন সময়ে ভিন্নভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে- গোরা; চামর; চিছা; ট্যাপারি; ডাটিভাতি; ফাণ্টুস; বাঁটুল; মাল; মিচরি; লাঠিম; হরিণঘাটা।

বোমা[১৯] শব্দের ক্ষেত্রেও দেখি – অনডা; আম; আলু; কদমা; গেদা; ছাতু; ছোটোখোকা; ডিমা; নাড়ু; পাঁউরুটি; পেটো; পেটা; রুটি; লাডডু; লেবু।

অপরাধজগতের স্মাগলাররা তাদের নিজস্ব শব্দের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আদানপ্রদান করে থাকে। তারা তাদের নিষিদ্ধ পণ্যের চালানকে 'কাম' বলে। যদিও অপরাধজগতের অধিবাসীরা তাদের অপরাধমূলক কাজ কে 'কাম' বলতেই পছন্দ করে। স্মাগলাররা মধ্যে নিষিদ্ধ দ্রব্যের সাংকেতিক নাম ব্যবহর করে[২০] –

রেশমী থান- কোকেন; এক নম্বর চিড়িয়া মারকা- জাপানে প্রস্তুত ককেনের ট্রেডমার্ক; কম্বল- আফিম; নম্বরি মাল- ট্রেজারির চোরাই আফিম; খাবার- গুলি; খোকী- পিস্তল।

এখন আমরা আলোচনা করে নিতে চাই বাংলা সাহিত্যের বেশকিছু উপন্যাস যেগুলিতে অপরাধজগতের যে ছায়া পড়েছে সেখানকার ভাষার দিকটা।

সমরেশ বসুর অন্যতম এক প্রতিনিধি স্থানীয় উপন্যাস হলো 'বাঘিনী'। প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬৭। সময়কাল ছয়ের দশকের সূচনা লগ্ন। অবক্ষয়িত সমাজব্যবস্থায় অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে মানুষ বেছে বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে ইল্লিসিট

লিকার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড স্মাগলিং-এ। উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্রই এই জীবনে আসতে চায় নি; কিন্তু পরিস্থিতি তাদের বাধ্য করেছে। লেখক ঘটনার বৈচিত্র্যে ও প্রেমের আখ্যান রচনার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের কায়া নির্মাণ করেছেন। চিরঞ্জীব ও বাগদী কন্যা দুর্গা ওরফে পারুলবালাদাসীর প্রণয়, ভিন্ন পন্থায় মদের চোরাচালান, আফগানি দপ্তরের সক্রিয়তা অত্যন্ত নিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে। এখানে যে স্মাগলিং এর চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, রাষ্ট্রের বিচারে তা অপরাধ আবার ভদ্র সমাজের বিচারেও।

প্রায় সমগ্র উপন্যাস জুড়ে চিরঞ্জীব ও দুর্গা নানা উপায়ে মদ চোলাই করেছে। সেখানে তাদের কথাবার্তা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ভাষার সম পর্যায়ভুক্ত। তবে তাদের অর্থাৎ চোলাই কারীদের কিছু বিশিষ্ট শব্দ এখানে লেখক তুলে ধরেছেন। উপন্যাসে চোলাই জগতের সবচেয়ে বেশি আলোচিত ও ব্যবহৃত শব্দ হল 'জাওয়া'। দেশী প্রথায় চোলাই করার সবচেয়ে প্রাচীন প্রথা হল জাওয়া। এই শব্দের প্রচলন মূলত চোলাই কারীদের মধ্যে প্রচলিত।

চিরঞ্জীব ও অন্যান্য চৌলাইকারীরা মদ চোলাই করে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে। তার মধ্যে অন্যত উপায় হল ব্লাডারে ভরে চোলাই পাচার। সেই চোলাইয়ের হিসাব প্রেরণকারীকে বোঝানোর জন্য তারা সাংকেতিক ভাষার সংখ্যার কথা বলে তাতেই প্রাপক বুঝে যায় চোলাইয়ের সংখ্যা – "চিরঞ্জীব বলল, দশটা আছে পাঁচ নম্বরি, চারটে দশ নম্বরি ।"[২১] এর অর্থ হল পাঁচ নম্বরের দশটা ব্লাডার অর্থাৎ মোট পঞ্চাশটি আছে। আর চার নম্বরের দশটা ব্লাডার অর্থাৎ চল্লিশটা আছে। এই নম্বরেই মদের পরিমাণ বোঝা যাবে। এভাবেই সাংকেতিক ভাষায় চোলাইয়ের কারবার চলতে থাকে।

এই কারবারে মদ কথাটি সাধারণত উচ্চারিত হয় না। তা 'মাল' বা চোলাই নামেই পরিচিত। অর্থাৎ 'চোলাই মদ' শব্দবন্ধটির দ্বিতীয় শব্দ 'মদ' বাদ দেওয়া হয়েছে এবং চোলাই নামটিই সকলের কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। শব্দটি সৃষ্টির পিছনে রয়েছে এই মদ তৈরির কৌশলটি। দেশী পদ্ধতিতে এই মদ তৈরি হয় বলে এই নামকরণ করা হয়েছে। তারা 'মাল' অর্থে চোলাইকেই বুঝে – "গাড়ি থেকে মাল খালাস করে নে।"[২২] মাল শব্দটি সমাজ জীবনে বহু ব্যবহৃত শব্দ। অর্থ ভিন্নার্থক- টাকা, মেয়ে, মাদক, মদ, ব্যক্তি প্রভৃতি। স্থান ও ক্ষেত্র বিশেষে এর অর্থ নির্ধারিত হয়।

ভদ্র সমাজে মদ শব্দের ব্যবহার প্রকাশ্যে প্রায় হয় না বললেই চলে। চোলাইয়ের জগতে এটি অনেক সময় 'জিনিস' নামেও পরিচিত। আসলে এটা একটা কোড ল্যাংগুয়েজ যারা এই পথের পথিক কেবল তারাই শব্দের উচ্চারণ মাত্র বুঝে নেয় বক্তা কী বলতে চাইছে।

চিরঞ্জিবের চোলাই মানে ও গুণে খ্যাত। কলকাতার চোলাই ব্যবসায়ী পরেশ দত্ত তার চোলাইয়ের প্রশংসা করতে গিয়ে 'জিনিস' শব্দের ব্যবহার করে – "টাটকা কড়া জিনিসের জন্য তোমাদের কাছে ছোটাছুটি।"[২৩]

চোলাইয়ের জগতের সঙ্গে জড়িত মেদের কেই সম্মানের চোখে দেখে না। তার বা তদের সম্পর্কে ব্যবহৃত হয় অপশব্দ – 'ছুড়ি'। এই অপশব্দটি এক সময় স্ল্যাং হিসাবে বিবেচিত হলেও বর্তমানে এটি মান্য সাহিত্যের পাতায় স্থান করে নিয়েছে। যদিও শব্দটির আভিধানিক অর্থ নবযুবতী বা বালিকা। কিন্তু চোলাইয়ের জগতে তা স্থূল অর্থেই ব্যবহৃত হয়। পরেশ দত্তের দলের লোকেরা 'ছুড়ি' শব্দটি দুর্গার সম্পর্কে প্রয়োগ করেছে তাকে অসম্মান করতে নয়; তার বুদ্ধিমত্তা, চাতুরি, ছলা, কৌশল এককথায় তার কার্য কুশলতার দিকটিই প্রকট হয়- "তবে মোশাই ছুড়ি একখানি বাগিয়েছেন। আফগারির বাবার সাধ্যি কি ওকে ধরে।"[২৪]

এই 'ছুড়ি' শব্দটি যখন চোলাই কারাবারে যুক্ত অন্য মেয়ে বীণা সম্পর্কে ব্যবহৃত হয় তখন সেই শব্দ অন্য অর্থ বহন করে। এখানে তা যেন বীণার দেহের স্থূলত্বকেই প্রকট করে– "ও ছুড়িকে নিয়ে আর কোন দিন আসবে না।"[২৫]

অক্রুর দে গুলিকে প্রথম চোলাইয়ের কাজে নামিয়ে ছিল। এই কাজে নামান বা লাগান তা এই কারবারে 'পিক' করা। লেখক এখানে অপরাধজগতের ভাষার বিস্তৃত নিদর্শন তুলে ধরেন নি। যা এসেছে তা মূলত প্রয়োজনের নিরিখে বা সেই জগতের ভাব ও ভাবনাকে প্রকট করতে। সেই স্বল্প বিচ্ছুরণেই চোলাই কারবারিদের মন, মানসিকতা, কর্মপদ্ধতির ছাপ স্পষ্ট হয়েছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কালের শহর কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজের অবক্ষয়ের পাশাপাশি যুবসমাজের ব্যক্তিক সংকট, উদ্দেশ্য ও আদর্শহীন বিপর্যস্ত মানবিক মূল্যবোধের ছায়া পড়েছে 'প্রজাপতি' উপন্যাসে। ১৩৭৪ সালের শারদীয়া 'দেশ' পত্রিকায় এর আত্মপ্রকাশ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গুণ্ডা' গল্প পড়ে লেখক অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এই ধরনের চরিত্র সৃষ্টিতে। তবে প্রাগুক্ত সাহিত্যিকের সৃষ্ট চরিত্রের বাচনভঙ্গি লেখকের কাছে 'অস্বাভাবিক' বলে মনে হয়েছে। কারণ তিনি মনে করেন- "ভাষা ও রচনারীতি বিষয়বস্তুর অনুগামী হওয়া উচিত।"[২৭] মস্তানদের কথা বলতে গেলে, তার মানসিকতাকে ধরতে হলে তাদের ভাষাকেই সাহিত্যের পাতায় তুলে ধরতে হবে। ভদ্র ভাষায় সেই চেহারা কখনই যথার্থতা লাভ করতে পারে না।

সমকালীন পশ্চিমবঙ্গের একশ্রেণির যুবকের আচার ব্যবহার ও সাম্প্রতিক ঘটনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় উপন্যাসের সুখেন চরিত্রের মধ্যে। সমগ্র উপন্যাস তারই ক্রিয়া কাণ্ডের আখ্যান। যদিও লেখক বলেছেন তিনি সুখেনের স্রষ্টা নন, তিনি সুখেনের এক সত্তার সন্ধানী। পাঠকের উদ্দেশ্য তিনি সুখেনের স্রষ্টাদের চিনে নেবার আবেদন জানিয়েছেন। ছয়ের দশকের কলকাতার এক ভদ্র পরিবারের সন্তান সুখেন। সে রকবাজ। পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে সমকালীন যুবসমাজের অধঃপতনের সরণিতে অস্থির পদচারণা। তাদের নাম দিয়েছে গুন্ডা, বদমাশ, মস্তান। সুখেন যেন পুরোপুরি ভাবে মস্তান হয়ে উঠতে পারে নি। রক্তের মধ্যে চালিত সংস্কার বা আদর্শবোধ তাকে নিজের কাছে সৎ রাখতে তাড়িত করেছে। কলেজ কর্তৃপক্ষের সততাহীন ক্রিয়াকর্ম, দাদাদের নীতিহীন স্বার্থসর্বস্ব রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়াকে সে মেনে নিতে পারে নি। গরিব কল্যাণের নাম করে গরিবদেরই শোষণ করে চলে রাজনৈতিক দলগুলি। এই সমস্ত অন্তঃসারশূন্য আচরণ সুখেনকে প্রতিবাদী করে তুলেছে। সে কোনো রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় নাম লেখায় নি। সমগ্র উপন্যাস জুড়ে তার প্রতিবাদ আছড়ে পড়েছে। স্বীয় উপলব্ধিতে রাজনীতি সর্বস্ব, অন্তঃসারশূন্য মধ্যবিত্ত সমাজের কুৎসিত চেহারাকে সে অনাবৃত করে তুলেছে। সেই নগ্ন রূপের দর্শনের কারণেই রাজনৈতিক দলের বোমার আঘাত শুধু তার অঙ্গহানিই করে নি তাকে মৃত্যুর কোলে শুইয়ে দিয়েছে। এই ঘটনাধারার মধ্যে ধরা পড়েছে অপরাধের স্বাক্ষর। সে স্বাক্ষরে ভাষা হয়েছে তার প্রকাশের মাধ্যম।

উপন্যসের নায়ক সুখেন ছয়ের দশকের বাংলার এক বিশেষ শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেছে। তাদের মুখের ভাষা যেমন হওয়া উচিত ঠিক তেমনি ভাষাই লেখক প্রয়োগ করেছেন। এপ্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্যটি উল্লেকগ কড়া যেতে পারে –

> "এই উপন্যাসের নায়ক আজকের দিনে এক রকবাজ ছেলে। উপন্যাসটি লেখা হয়েছে তারই জবানীতে। তারই ভাষাতে। এই রকবাজ ছেলেরা যে ভাষায় কথা বলে এখানে সেই ভাষারই ব্যবহার করা হয়েছে। তার মুখে যদি মার্জিত ভাষা বসিয়ে দেওয়া হত তাহলেই উপন্যাসটি ব্যর্থ হত। উপন্যাসটি এতে বাস্তবধর্মী হয়েছে। হয়েছে জীবন্ত। যাদের কথা বলা হয়েছে তাদের মুখের কথাই লেখক বসিয়ে দিয়েছেন।আমি মনে করি এই উপন্যাসে স্ল্যাং শব্দ বেশি ব্যবহারের এটাই কারণ।"[২৮]

একথা ঠিকই যে উপন্যাসে অপরাধজগতের 'কোড ল্যাংগুয়েজ' অপেক্ষা রকবাজদীর অশ্লীল শব্দের ব্যবহার বেশি হয়েছে। সুখেনকে এখানে একজন গুণ্ডা, মস্তান, অপরাধী হিসাবেই দেখেছি। তার ভাষা অপরাধীর ভাষা হিসাবেই বিবেচিত হবে।

উপন্যাসে সুখেন প্রায়শই 'সসা' শব্দের ব্যবহার করেছে। এটি আসলে 'শালা' শব্দের রূপান্তর। অপরাধজগতে যে উলটি বাতোলার ব্যবহার আছে এটি তারই উদাহরণ। ঔপন্যাসিক শব্দটিকে সরাসরি ব্যবহার না করে অদল বদল করে এর প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

সুখেন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষদের বর্ণনা প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার আশ্রয় নিয়েছে। সে উচ্চবিত্ত সমাজের নারীদের প্রসঙ্গে অবলীলায় স্ল্যাং সব্দে ব্যবহার কএ চলে। আবার অধ্যাপক যশোদাবাবুর বর্ণনা দিতে গিয়ে সে তার চরিত্রানুসারী ভাষার ব্যবহার করে –

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-3, Issue-Iv, October 2023, tirj/October23/article-55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 484-495
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"যশোদাবাবুটিকে আমার কেমন একটু বেঁটে সেটে মটা মেটে রং দুমুখো ঢ্যামনা সাপের মতো মনে হয়।"[২৯]

'ঢ্যামনা সাপ' শব্দবন্ধের প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে লেখক শুধু সুখনের দৃষ্টিতেই নয় পাঠকের কাছে তার চরিত্র সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন।

সুখেন যখন যৌনতার আশ্লেষ নিতে গিয়ে শিখাকে দেখে তখন তার ভাষা হয় একটু কাব্যিক। তবে, সেই কাব্যের মধ্যে নেই শিষ্ট সমাজের মার্জিত রুচির ছাপ; সেখানে তার জগতের উপস্থিতিটি অত্যন্ত স্পষ্ট –

"সসাহ আমার হাত দুটো যেন কেঁই কেঁই করে ওঠে হ্যাঙলা কুকুরের মতো।"[৩০]

নিজেকে যৌনতা সর্বস্ব লোভী কুকুরের সঙ্গে বর্ণনা এবং সেটা করতে গিয়ে যে ভাষার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে তা এককথায় অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও বাস্তবধর্মী।

কারখানার ম্যানেজার সম্পর্কে সুখেন যে ভাষার প্রয়োগ করে তা অত্যন্ত যথোপযুক্ত। কলেজের পরীক্ষায় নকলে বাধা দয়া অধ্যাপকের বিরুধে সে যে ভাষা ব্যবহার করেছে তা শুধু তার জগতের পরিচয়বাহীই নয় তা যেন সমকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার এক টুকরো ছবি তুলে ধরে- "আরে যা যা, পেঁদিয়ে খাল খিচে দেবো।"[৩১] একজন সমাজবিরোধীর কাছে এর বেশি কিছু আশা করা যায় না।

সুখেন ব্যবহৃত শব্দের অধিকাংশই আজকের সমাজে আখছার হয়ে চলেছে। শুধু মুখের ভাষাতেই নয় সেগুলি সাহিত্যের পাতাতেও স্থান করে নিয়েছে বা নিচ্ছে।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'ঘুণপোকা' উপন্যাসে অপরাধজগতের বিস্তৃত বিবরণ নেই। স্বল্প পরিসরে উঠে এসেছে এক শ্রেণির অপরাধীদের কথা। যাদের ভাষায় তাদের জগতে ক্ষীণ এক স্রোত বয়ে চলেছে।

শ্যামের ছেলেবেলার বন্ধু মিনু। এক সময়ে তারা একে ওপরের অনেক গোপন কথা জানলেও আজ তারা একে ওপরের কাছে অপরিচিত। একই শহরের মধ্যে দুই পৃথক জগতে তাদের বাস। শ্যাম মাইনের টাকা নিয়ে ভিড় বাসে চেপে গেলে মিনু তাকে টেনে নামায়। কেননা, সেই "বাসটা গরম ছিল।"[৩২] বলেই সে একাজ করেছে। গরম শব্দটি অপরাধজগতে এক বিশেষ অর্থ বহন করেছে – বাসে পকেট মারের উপস্থিতি বোঝাতে শব্দটির ব্যবহার। নিত্য যাতায়াতের কারণে শ্যামের কাছে শব্দটি খুবই পরিচিত। পকেটমারদের কাছে 'গরম' শব্দটি যে অর্থ বহন করে অন্যান্য অপরাধীদের কাছে এটি ভিন্ন অর্থের দ্যোতনা সৃষ্টি করে।

মিলু শ্যামকে সুরক্ষিত ভাবে বাড়ি পৌঁছোবার জন্য তাদের ভাষাতেই পরামর্শ দেয়। 'ঠাণ্ডা' বাসে করে সে শ্যামকে বাড়ি ফিরতে বলে। এটিও অপরাধীদের কাছে একটি অতি পরিচিত শব্দ। এর অর্থ হল যে বাসে পকেটমার অনুপস্থিত বা যে বাসে ছিনতাই হবার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।

শ্যাম ও মিলুর কাল্পনিক সংলাপে লেখক অপরাধজগতের বেশ কিছু নিজস্ব শব্দের উল্লেখ করেছেন–

"আমাকে দলে নিবি গুরু? দেখিস শালা, দু হাতে চালাব মেশিন কিংবা পাঞ্চ, তলপেটে ছড়া ঢোকাব যেন মাখনে, দেখগে নিস গুরু, কেমন পকাপক চলে সোডার বোতল।"[৩৩]

গুরু, মেশিন শব্দগুলো অপরাধজগতের কাছে অতি পরিচিত।আর ব্যবহার তাদের জগতে প্রায়শই হয়ে থাকে। এছাড়াও শ্যামের কথায় আমরা পাই –

"...কি চলবে গুরু? ঝিট না অ্যান্টিক? শ্যাম জানে এভাসা বুঝে নেবে মিনু, কেননা এ মিনুদেরই ভাষা – ঝিট মানে গাঁজা, আর অ্যান্টিক মানে চোলাই।"[৩৪]

শ্যাম সাধারণ মধ্যবিত্ত। সে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় অপরাধজগতের এই সব ভাষা আয়ত্ত করেছে। লেখক নিজেই এই ভাষার অর্থ পাঠককে জানান দিয়েছেন।

শ্যামের অন্য কথাতেও অপরাধজগতের ভাষার উল্লেখ পাওয়া যায় –

"...না গুরু, তুই ঢসকে গেছি তোর বয়স শুরু হয়ে গেছে। ...যাক গে শালা, এখন কি চলছে তোর? ছিনতাই না এক-দুশোর কেপমারী? বোর্ডে ধেরিয়েছিস? চাঁপার ঝাঁপিতে রাত গেছে রে শালা! ওর তো ক্যাশ মেমো দেয়না, দিলে ক'হাজারে দাঁড়াতো গুরু?"[৩৫]

এই ভাষা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে লেখক মিলু চরিত্রের ভেতরের কথা প্রকাশ্যে এনেছেন। যাতে স্পষ্ট হয়েছে তাদের জগত।

'নীলু হাজরার হত্যা রহস্য' উপন্যাসে রাজনীতি আর সমাজবিরোধীদের সহাবস্থানের ছবি ধরা পড়েছে। আলোচ্যমান উপন্যাসে অপরাধজগতের বিস্তৃত বিবরণ না থাকলেও তার যে খণ্ডচিত্র উপস্থাপিত হয়েছে তাতে সেই জগতের ভাষার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটে। সেই স্বল্প উল্লেখেই আমরা বুঝে নিতে পারি অপরাধী সমাজের চালচিত্র।

নব একজন অপরাধী। খুনের আসামী। নানা অপরাধে যুক্ত এই মানুষটির রয়েছে অপরাধী মনন আর তার কথায় আছে তার জগতের ছাপ। জয়কে সঙ্গে নিয়ে জেলে তার কাছে আসা ব্যক্তিটির সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা চালায় আর তার দেখা না পেয়ে তার মধ্যে হতাশা দেখা দেয়। সেই মনভাবের প্রকাশ ঘটেছে তার ভাষায়। আর সেই ভাষার মধ্যে তাদের জগতের নিজস্বতার ছাপ র‍্যেছে – "শালা কোথায় যে গায়েব হয়ে গেল।"[৩৬]

এখানে যেমন স্ল্যাং শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে তেমনি প্রযুক্ত হয়েছে সাধারণ আরবি শব্দ 'গায়েব'। মান্য চলিত ভাষায় এর ব্যবহার প্রায়শই চোখে পড়ে। কিন্তু এটি মূলত বেশি ব্যবহৃত হয় অপরাধজগতে। অর্থাৎ এর প্রচলন ঘটেছে অপরাধজগত থেকেই। কেননা, এর অর্থই হল হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া। যা অপরাধীদের ক্ষেত্রে প্রায়শই ঘটে থাকে। নব রাজনৈতিক নেতাদের চরিত্র সম্পর্কে তার মত ব্যক্ত করেছে নিজস্ব ভাষায় – "খানকির ছেলে ফোঁটা কেটে বোষ্টম সাজছে।"[৩৭] অপ্রাধজগতের ভাষায় স্ল্যাং শব্দের প্রয়োগের এ হল যথার্থ উদাহরণ।

নব তার সঙ্গীদের মুখে ফালতু, খোঁচড়, হারামি, মজাকি শব্দগুলি সচরাচর ব্যবহৃত হয়। এগুলি মান্য সাহিত্যে বা শিষ্ট সমাজে ভিন্ন অর্থ বহন করলেও অপরাধগজতে এদের অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন। 'ফালতু' শব্দটি মান্য সাহিত্যে বেকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর অপরাধজগতে এর অর্থ হল চ্যাংড়া ছেলে।[৩৮] 'খোঁচড়' শব্দটির উদ্ভব অপরাধজগতে। এর অর্থ হল পুলিশ[৩৯] 'হারামি' একটি স্ল্যাং। রকবাজদের মধ্যে এর প্রয়োগ বেশি লক্ষ করা যায়। অপরাধীরাও এই ধরনের স্ল্যাং ব্যবহার করে থাকে। 'মজাকি' শব্দটি অপরাধজগতে ব্যবহৃত হয় চালাকি অর্থে বা গোপন অর্থে।[৪০]

কেলো নবকে যখন জিজ্ঞাসা করে "বাড়িতে লালবাজারের খোঁচড়েরা নেই?"[৪১] তখন আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না সে এখানে পুলিশের কথা বলতে চাইছে। নব মাধবকে স্পষ্ট ভাষায় যখন বলে – "মাজাকি রাখো।"[৪২] তখন আমরা বুঝতে পারি সে এর দ্বারা চালাকি না করার বা গোপন না করার কথা বলতে চাইছে।

'কালপুরুষ (১৯৮৫) সমরেশ মুজুমদারের অন্যতম উপন্যাস। নায়ক অনিমেষের জীবনপর্বের এটি আরেকটি স্তর। 'উত্তরাধিকার'- এ যে অনিমেষকে আমরা প্রত্যক্ষ করি 'কালবেলা'-য় সে একেবারে ভিন্ন। এক উত্তাল সময়ের তরঙ্গে দুলতে দুলতে অনিমেষ এসে পৌঁছেছে গৃহীজীবনে। প্রথম দুই স্তরের পর তার উত্তরণ ঘটেছে 'কালপুরুষ'-এ। তার আশা পুত্র অর্কের মধ্যে নিজের সমাজতান্ত্রিক আদর্শের নিশানটি সঁপে দেওয়া। কিন্তু আশা আর বাস্তবের মেলবন্ধন ঘটে না। কেননা–

> "...সমকালীন অন্তঃসারহীন কুটিল রাজনীতি এবং পঙ্কিল সমাজব্যবস্থা অর্ককে করে তুলেছিল অন্ধকার অসামাজিক রাজত্বের প্রতিনিধি।"[৪৬]

তবে তার মধ্যে প্রবহমাণ ছিল তার বাবার আদর্শবাদ আর মায়ের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও আত্মত্যাগের পবিত্র সঙ্কল্প। সেই অদৃশ্য শক্তির চালনায় সে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করেছে এক ভিন্ন মানসিকতা যা তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে মানবতার মহাসম্মিলনে। সুবিধাবাদী রাজনৈতিক শক্তি তার এই আদর্শবোধ, মানব কল্যাণকামী চিন্তাধারায় প্রাণিত হয় নি পরিবর্তে তারা তার স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে নিজেদের স্বার্থহানির আশঙ্কায়। লেখকের প্রতীতি ভিন্ন। অনিমেষ আর মাধবীলতার সন্তান অর্ক – "যার ওপর নাম সূর্য – তার আবির্ভাবকে কি চিরকালের মতো রুদ্ধ করে রাখা যায়?"[৪৭] শুধু প্রশ্নই নয় এটাই যেন উপন্যাসের মূল বক্তব্য।

উপন্যাসে অনিমেষকে আমরা পাই অতীতের দিনগুলিকে পিছনে ফেলে পুত্র অর্কের মধ্যে আদর্শ, মূল্যবোধ আর মানবিকতার ছাপ রাখার চেষ্টায় রত পিতা হিসাবে। কিন্তু পরিবেশ যেবন অর্ককে সব কিছুর থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। অর্কও জড়িয়ে পড়ে রাজনীতির জটিল আবর্তে। নিপীড়িত মানুষের মুক্তির পথ খোঁজার সাধনায় অর্ক ব্যাপৃত

হয়। আলোচ্যমান উপন্যাস অপরাধজগতের আখ্যান না হলেও এখানে অপরাধজগতের ছাপ লক্ষ করা যায় কাহিনির প্রাসঙ্গিকতার পথ বেয়ে। এখন আমরা সেগুলির সন্ধানে রত হব।

অর্ক বস্তি এলাকায় বড়ো হয়েছে। অভাব সেখানকার নিত্যসঙ্গী। সে অভাব অর্থের পাশাপাশি শিক্ষা ও মানসিকতার। তাই বেঁচে থাকার তাগিদে সেখানকার যুবসমাজ খুব সহজেই অপরাধের কানাগলিতে পথ হারিয়ে ফেলে। বেছে নেয় মস্তানি, টিকিট ব্ল্যাক, ওয়াগেন ব্রেকেরের জীবন। আসলে এ জীবন তারা বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। অর্থ, ক্ষমতা আর মাদকের স্বাদ পেয়েছে খুব সহজেই। ধীরে ধীরে তারা হয়ে উঠেছে সমাজবিরোধীগুণ্ডা, মস্তান। এরা যেন রক্ত বীজের জাত। পৃথিবী থেকে এদের সরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। এই সব যুবকদের ভাষায় অপরাধজগতের ভাষার স্বল্প বিচ্ছুরণ ঘটে। তবে তাদের ভাষায় সবচেয়ে বেশি ধরা পড়ে স্ল্যাং এর দিকটা।

বস্তির কদর্য পরিবেশ তাদের মনে গভীর ভাবে ছাপ ফেলেছে। আর তাই তাদের ভাষায় স্ল্যাং-এর আধিক্য। এমনকি অর্ক মাধবীলতার শিক্ষায় বড় হওয়া সত্ত্বেও সে পরিবেশের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারে নি। সে অবলীলায় অপশব্দের ব্যবহার করে- "তখন থেকে আপনি ন্যাকড়াবাজি করছেন।"[৪৯] শব্দটি বস্তি অঞ্চলের পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়। মান্য চলিত ভাষায় এর ব্যবহার নেই। এর অর্থ হল 'ন্যাকামি করা বা বদমায়েশি করা'[৫০]। তবে অর্ক এখানে শব্দটি ন্যাকামি অর্থে ব্যবহার করেছে।

বিলু, কিলাদের সঙ্গে মিশে অর্ক অনেক অপশব্দ শিখেছে। বিলুরা সে সব শব্দ অবলীলায় বলে। তারা না জানে সহবত তাদের না আছে সৌজন্যতাবোধ। অর্ক বিলাস সোমের স্ত্রীর সঙ্গে হাসপাতালে কথা বলার সময় বিলু অর্ককে পরামর্শ দেয় তার কাছ থেকে টাকা চেয়ে নেবার জন্য। অর্ক রাজি না হলে বিলু তাকে খুব সহজেই বলে-

> "ও তোর পিরিতের নাঙ না কি বে! ওই যে আসছে, আমি সরে যাচ্ছি, তুই মাল চা।"[৫১]

'নাঙ' একটি স্ল্যাং শব্দ। এটি সাধারনত গ্রাম্য নারীদের ঝগড়ায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে, অপরাধজগত বা বস্তি অঞ্চলেও এর ব্যবহার সমান তালে হয়ে থাকে। শব্দটির অর্থ হল- 'উপপতি। সংস্কৃত নগ্ন শব্দ থেকে এর উদ্ভব।'[৫২] এই জগতে টাকাকে মাল বলা হয়। যদিও মাল শব্দটির ব্যবহার হয় নানা অর্থে- কখন নারী, কখনও মদ কখনও বা মাদক দ্রব্য অর্থে আবার কখনও ব্যক্তি অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

বিলু, কিলারা টিকিট ব্ল্যাক করে। সেই ব্ল্যাকারদের নির্দিষ্ট এলাকা আছে। তার জন্য তাদের নির্দিষ্ট লোকের পারমিশন নিতে হয়। ব্ল্যাকারদের নিজস্ব ভাষা আছে- "দুটাকা পঁয়তাল্লিশ আট টাকায় যাচ্ছে।"[৫৩] যার অর্থ আট টাকায় দুটাকা পঁয়তাল্লিশ টাকা লাভ থাকবে।

এলাকায় নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া আছে। তার অন্যথা হলে তারা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়তে দ্বিধা করে না-

> "...আরে, আমি সাফ বলে দিচ্ছি। নতুন পার্টি ঢোকাতে চাইলে হেভি কিচাইন হয়ে যাবে।... এ খোমা অ্যাদ্দিন কোন গাদিতে ঝুলিয়ে ছিলে চাঁদ!"[৫৪]

পার্টি শব্দটি অপরাধজগতের একটি অতি পরিচিত শব্দ। তবে এর ব্যবহার ক্ষেত্র বিশেষে আলাদা হয়ে যায়। এখানে পার্টি অর্থে দল বা লোকের কথা বোঝানো হয়েছে। আবার 'খোমা' শব্দের অর্থ হল মুখ। বক্তার বক্তব্য হল বিলু এতদিন কোথায় ছিল! তার মুখ একেবারেই অপরিচিত।

এ ভাবেই অপরাধজগতের স্ল্যাং শব্দ বহুল ব্যবহৃত হয়ে চলে।

অপরাধীদের ভাষা ব্যবহারের ধরন দেখে তাঁর মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। তার আলোচনায় নোতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। জানা যায় পাতালপুরীর জগতের রীতিনীতি, আচার-আচরণের কথা অর্থাৎ পাতালপুরীর রহস্য লোকসমক্ষে তখনই প্রকাশ করা সম্ভব যখন সেই জগতের ভাষা সম্পর্কে আমরা অবহিত হতে পারব। সচেতন নাগরিক হিসাবে আমাদের সেই দায়িত্ব আমাদের ওপরে বর্তায়।

Reference :

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ, (সংকিলত ও সম্পাদিত), বঙ্গীয় শব্দকোষ **১**ম খণ্ড, সাহিত্য অকাদেমি, অষ্টম মুদ্রণ, ২০১১, পৃ. ১০৯
২. মিত্র, সুবলচন্দ্র, (সংকলিত), সরল বাঙ্গালা অভিধান, নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ, এপ্রিল, ২০১৭, পৃ. ৭৯
৩. সংসদ বাংলা অভিধান, নতুন সংস্করণ, সপ্তদশ মুদ্রণ, অগস্ট, ২০১১, পৃ. ৩৮
৪. দাস, জ্ঞানেন্দ্রমোহন, (সংকিলত ও সম্পাদত), বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, সাহিত্য সংসদ, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, অগস্ট, **১৯৭৯**, পৃ. ৮৩
৫. চৌধুরী, জামিল, (সম্পাদিত), আধুনিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, আষাঢ়, **১**৪২৩ (জুন; ২০**১**৬), পৃ. ৬২
৬. গোস্বামী, বিজনবিহারী, (অনুবাদিত ও সম্পাদিত), শুক্ল যর্জুবেদ, হরফ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর, **১৯৬০**, পৃ. **১৮০**
৭. মল্লিক, ভক্তিপ্রসাদ, অপরাধ জগতের ভাষা ও শব্দকোষ, দে'জ পাবলিশিং, কলি-৭৩, তৃতীয় সং, নভেম্বর, ২০১১, পৃ. ৬৭
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. **১১৬**
১২. ঘোষাল, ড.পঞ্চানন, অপরাধ-বিজ্ঞান **১**ম খণ্ড, লালমাটি সংস্করণ, বইমেলা ২০১৮, পৃ. ২২১
১৩. মল্লিক, ভক্তিপ্রসাদ, অপরাধ-জগতের ভাষা ও শব্দকোষ, দে'জ পাবলিশিং, কলি-৭৩, তৃতীয় সং, নভেম্বর ২০১১, পৃ. ৬২
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১
২০. ঘোষাল, ড.পঞ্চানন, অপরাধ-বিজ্ঞান **১**ম খণ্ড, লালমাটি সংস্করণ, বইমেলা, ২০১৮, পৃ. ২২৩
২১. বসু, সমরেশ, বাঘিনী, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন, **১৩৬৭**, পৃ. **১৮৬**
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. **১৮৭**
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. **১৮৭**
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. **১৮৭**
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. **১৯০**
২৬. বসু, সমরেশ, বিবর, আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০০৭, পৃ. **১১৮**
২৭. বসু, সমরেশ, প্রজাপতি, আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, দশম মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ২০০২, ভূমিকা।
২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. **১৪৩**
২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

৩২. মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু, ঘুণপোকা, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুন, ১৯৭০, পৃ. ২২

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

৩৬. মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু, নীলু হাজরার হত্যা রহস্য, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, জুন ২০০৭

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

৩৯. মল্লিক, ভক্তিপ্রসাদ, অপরাধ-জগতের ভাষা ও শব্দকোষ, দে'জ পাবলিশিং, কলি-৭৩, তৃতীয় সং, নভেম্বর, ২০১১, পৃ. ১৯৬

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮

৪২. মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু, নীলু হাজরার হত্যা রহস্য, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুন, পৃ. ৯৪

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

৪৪. মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু, শ্যাওলা, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, সপ্তম মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ১৯৭৭, পৃ. ৫২

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

৪৭. মজুমদার, সমরেশ, কালপুরুষ, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৯৯০, মলাট।

৪৮. প্রাগুক্ত

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

৫০. বসু, অভ্র, বাংলা স্ল্যাং সমীক্ষা ও অভিধান, প্যাপিরাস, প্রথম প্রকাশ, চতুর্থ সংস্করণ, মার্চ ২০১৬, পৃ. ৩৫৭

৫১. মজুমদার, সমরেশ, কালপুরুষ, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৯৯০, পৃ. ৫২

৫২. বসু, অভ্র, বাংলা স্ল্যাং সমীক্ষা ও অভিধান, প্যাপিরাস, প্রথম প্রকাশ, চতুর্থ সংস্করণ, মার্চ ২০১৬, পৃ. ৩৫৯

৫৩. মজুমদার, সমরেশ, কালপুরুষ, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৯৯০, পৃ. ৪২

৫৪. মজুমদার, সমরেশ, কালপুরুষ, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৯৯০, পৃ. ৪৪

Bibliography :

অপরাধবিজ্ঞান, রায় পান্না রানী, অপরাজিতা প্রকাশন, ঢাকা, চতুর্থ প্রকাশ, ২০১৫।

অপরাধ-বিজ্ঞান ১ম খণ্ড, ঘোষাল ড.পঞ্চানন, লালমাটি সংস্করণ, বইমেলা ২০১৮।

অপরাধজগতের ভাষা ও শব্দকোষ, মল্লিক ভক্তিপ্রসাদ, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ তৃতীয় সংস্করণ, নভেম্বর ২০০১।